জাতির কী রূপ

প্রশান্ত ত্রিপুরা

ভূমিকা

এই নিবন্ধে 'নৃতত্ত্ব', ইতিহাস ও রাজনীতির আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে 'জাতি' ধারণার বিভিন্নমুখী ও পরিবর্তনশীল নির্মাণ এবং প্রয়োগের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শিরোনামের প্রেরণা এসেছে লালনের একটি পরিচিত গানের কথা থেকে, যে প্রেক্ষিতে 'জাতি' (বা 'জাত') শব্দটির অর্থ এক রকম। আবার আমরা যখন আলোচনা করি, তর্ক করি, বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে কী নামে পরিচিত হবে–বাঙালি, না বাংলাদেশি অথবা এদেশে বসবাসরত তথাকথিত উপজাতিরা কিসের 'উপ', এবং তারা এদেশের 'প্রকৃত আদিবাসী' কি না, তখন জাতি প্রত্যয়টি এবং এর সাথে সম্পর্কিত 'জাতীয়তা' ও অন্যান্য ধারণা নতুন অর্থ নিয়ে হাজির হয়। এ নিবন্ধে আপাত দৃষ্টিতে সম্পর্কহীন এই উভয় বিষয়কে একসূত্রে গাঁথার মাধ্যমে এই বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক শৃঙ্খল থেকে উত্তরণের জন্য লালন গান বেঁধেছিলেন, তা-ই ভিন্নরূপে ক্রিয়াশীল রয়েছে সমকালের জাতীয়তাবাদী প্রকল্পসমূহেও। বিষয়টা বোঝানোর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঙালি ও বাংলাদেশি পরিচিতি নির্মাণের প্রেক্ষিতে যারা অন্ত্যজ হয়ে পড়েছে, বা এমনকি যাদের অস্তিত্বই আর স্বীকৃত নয়, সেই 'আদিবাসী'দের প্রসঙ্গের উপর আমরা বিশেষভাবে নজর দেব।

ভূমিকায় উল্লিখিত 'নৃতত্ত্ব' পদটির একটা ব্যাখ্যা শুরুতেই দিয়ে রাখি, যা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য বোঝার জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। পাঠক নিশ্চয় জানেন যে, শব্দটি একটা জ্ঞানকাণ্ডের পুরনো নাম, আবার সাম্প্রতিককালে ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন–'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' ধরনের প্রয়োগে। উল্লেখ্য, ইংরেজিতে 'এনথ্রোপলজি' নামে পরিচিত শাস্ত্রেরই পুরনো প্রতিশব্দ হলো 'নৃতত্ত্ব', যার বদলে বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নৃবিজ্ঞান' নামটিই প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেক্ষিতে 'নৃতত্ত্ব' পদটি এই নিবন্ধে নিয়ে আসা হয়েছে সচেতনভাবে, বিশেষ উদ্দেশ্যে। কারণ এটির সাথে মিশে আছে অধুনা বাতিল বলে বিবেচিত ঔপনিবেশিক যুগের কিছু ধ্যানধারণার জঞ্জাল, যেগুলো এখনো দিব্যি চালু রয়েছে বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজের লেখালেখিতে–'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' বা 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ধরনের প্রয়োগে এবং সম্প্রতি নতুন জীবন লাভ করেছে সংবিধানে সংযুক্ত 'উপজাতি' ও 'নৃ-গোষ্ঠী'র ধারণার মাধ্যমে।

'নৃতত্ত্ব' পদের এই গোলমেলে কিন্তু প্রবল উপস্থিতি তথা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারণাগত সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসা ও প্রশ্নবিদ্ধ করা আমার নিবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য। এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে যেসব বিষয়ের উপর আমরা নজর দেব সেগুলো হলো 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', 'বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস' ও 'বাঙালি পরিচয়ের রাজনৈতিক সীমানা'। এসব বিষয়ের উপর আলোচনার জের ধরে আমরা উপসংহার টানার চেষ্টা করব, কিভাবে রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্করণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে সমকালের কিছু 'ছোট জাত', সাধু ভাষায় যাদের নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃ-গোষ্ঠী'।

'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' অন্বেষার স্বরূপ

একটা পারিভাষিক উদ্ভাবন হিসেবে বাংলা ভাষায় 'নৃতত্ত্ব' শব্দটির সংযোজন নিশ্চয় খুব বেশি আগের ঘটনা নয়, যা বড়জোর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, বাস্তবে হয়তো বা আরো পরে, ঘটেছিল। অন্যদিকে 'নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' বা 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' ধরনের প্রয়োগের মাধ্যমে নৃতত্ত্ব পদের যে ভিন্ন ব্যবহার শুরু হয়, তা সম্ভবত আরো অনেক পরের–আনুমানিক তিন দশক আগের ঘটনা। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, এ ধরনের ক্ষেত্রে 'নৃতাত্ত্বিক' শব্দটা ব্যবহার করা হয় 'ethnic' বা 'racial' অর্থে, যা সম্ভবত চালু হয়েছিল 'নৃতত্ত্ব' নামক জ্ঞানকাণ্ড সম্পর্কে প্রচলিত কিছু সেকেলে ধ্যানধারণার সাথে ethnicity বা race ধারণার কোনো প্রতিষ্ঠিত বাংলা প্রতিশব্দ না থাকার সমস্যা যুক্ত হয়ে।[১] শব্দটার এ ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায় বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, যেখানে তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'।[২] এ অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় ও পরিধি অনুসারে 'নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' কথার অর্থ দাঁড়ায় রেস সংক্রান্ত পরিচিতি। উল্লেখ্য, বইটির এক জায়গায় (পৃষ্ঠা ৭১-৭২) রেস ধারণার দৈহিক বৈশিষ্ট্যকেন্দ্রিক সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হয়েছে মিখাইল নেস্তুর্খ নামক একজন সোভিয়েত প্রাইমেটবিদ-নৃবিজ্ঞানীর লেখা ১৯৬৭ সালের একটি গ্রন্থ থেকে।[৩]

একই জায়গায় (পৃষ্ঠা ৭১) পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা race অর্থে নৃ-গোষ্ঠী [শব্দটি] ব্যবহার করব।'[৪] অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধানে ২০১১ সালে সন্নিবেশিত 'নৃ-গোষ্ঠী' শব্দটির সরকারি ইংরেজি ভাষ্য দেওয়া আছে ethnic sect হিসেবে। আবার পত্রপত্রিকাসহ বিভিন্ন সরকারি দলিলপত্রে আগে থেকেই ethnic group অর্থে 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' ধারণারও প্রচলন ছিল। 'নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' ধরনের শব্দগুচ্ছ ব্যুৎপত্তিগতভাবে ভুল হলেও তা যখন বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত ও দেশের স্বনামধন্য পণ্ডিতদের দ্বারা সম্পাদিত গ্রন্থে স্থান পায়, তখন কিভাবে সেই ভুল ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

উল্লেখ্য, বর্তমান সংবিধানের ইংরেজি ভাষ্যে আমরা minor race শব্দগুচ্ছটি দেখতে পাই, যেটিকে দেখানো হয়েছে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' পদের ভাষান্তর হিসেবে। এদিকে শুধু 'জাতি' হিসেবেও race শব্দটিকে বাংলায় অনুবাদ করেন অনেকে। যেমন–ব্রিটিশ শাসনামলে লেখা 'Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal' নামক একটি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ (ফওজুল করিমের করা ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত) প্রকাশিত হয়েছে 'পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ' শিরোনামে।[৫]

অতি সম্প্রতি (২০১৪ সালে) 'অনগ্রসর নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা, সমান সুযোগ ও পূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ' নামে ইন্টারনেটে পাওয়া একটি ধারণাপত্রেও রেস ধারণার অনুরূপ বাংলা অনুবাদ লক্ষ করা যায়।[৬] সেখানে racial discrimination-এর বাংলা করা হয়েছে 'জাতিগত বৈষম্য', এবং একই প্রেক্ষিতে ইংরেজি national পদটির বাংলা করা হয়েছে 'জাতিগত জাতীয়'!

অর্থাৎ বাংলায় 'জাতি' শব্দটির সাথে বিভিন্নভাবে মিশে আছে ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত একাধিক ধারণা–race, ethnicity, nation ইত্যাদি। স্পষ্টতই, এসব ক্ষেত্রে অনুবাদ সংক্রান্ত ও ধারণাগত কিছু সমস্যা রয়েছে, যেগুলো 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' অন্বেষার কাজে বাড়তি জটিলতা যোগ করে।

তবে উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বর্তমান নিবন্ধের পরিসরে যে বিষয়ের প্রতি পাঠকদের বিশেষ মনোযোগ চাওয়া হচ্ছে তা হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ দৈহিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক রেস ধারণা নৃবৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই সমস্যাজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল, ফলে সমকালীন নৃবিজ্ঞানে এটি অচল ও পরিত্যাজ্য হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে কয়েক দশক হলো।[৭] উল্লেখ্য, রেস সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধ্যানধারণার রাজনৈতিক পরিণতি কেমন বিভীষিকাময় হতে পারে, আর্য শ্রেষ্ঠত্ববাদী নাৎসিরা তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখিয়েছিল। আধুনিক মার্কিন নৃবিজ্ঞানের জনক বলে খ্যাত বোয়াস, যিনি জার্মানি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত হয়েছিলেন, অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে তাঁর বিভিন্ন গবেষণাকর্মের মাধ্যমে 'রেস' ধারণার অসারতা এবং ভাষা ও সংস্কৃতির ধারণার সাথে এটিকে গুলিয়ে ফেলার সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছিলেন।[৮] পরবর্তীকালে জিনভিত্তিক গবেষণার ফলাফলসহ জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন অগ্রগতির ফলে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, 'নিগ্রোয়েড', 'মঙ্গোলয়েড', 'ককেশয়েড' প্রভৃতি রেস-এর ধারণার বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা উপযোগিতা নেই।

অথচ বাংলা একাডেমি থেকে অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' খোঁজা হয়েছে এমন পরিত্যাজ্য ধারণার ভিত্তিতে। শুধু তা-ই নয়, সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক যুগের 'প্রশাসনিক-নৃতাত্ত্বিক' বিভিন্ন উৎস (যেমন রিজলি)[৯] থেকে আহৃত এমন সব তথ্য-উপাত্ত, যেগুলো ছিল তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত সব দিক থেকেই আরো ত্রুটিপূর্ণ। এসব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে এখনো যাঁরা 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' খোঁজায় ব্যস্ত রয়েছেন, বা 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী'র ধারণা ব্যবহার করছেন, বৈশ্বিক বিদ্যাজাগতিক মানদণ্ডে তাঁরা আসলে একশ' বছর পিছিয়ে রয়েছেন!

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বাংলা একাডেমি থেকে 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' শিরোনামের অধ্যায়যুক্ত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থ যে বছর প্রকাশিত হয়েছিল (১৯৮৭ সালে), তখন বাংলাদেশের প্রথম নৃবিজ্ঞান বিভাগ সবেমাত্র এক বছরে পা দিয়েছে (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)। পরবর্তীকালে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নৃবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হলেও তা মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও বিভিন্ন সমকালীন প্রসঙ্গকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে।

ফলে এদেশের বিদ্বৎসমাজে 'নৃতত্ত্ব', 'নৃ-গোষ্ঠী' প্রভৃতি ধারণাকে ঘিরে যে পশ্চাৎপদ জ্ঞান শিকড় গেড়ে আছে, সেটিকে হটানোর ব্যাপারে এখনো খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারেনি বাংলাদেশে গড়ে ওঠা নৃবিজ্ঞানী সমাজ। তবে সাধারণভাবে অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ডেও আসলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন অনেক ধ্যানধারণা, তত্ত্ব ও পদ্ধতি বহাল তবিয়তে আছে, যেগুলো বৈশ্বিক পরিসরে সমকালীন বিদ্যাজগতে বাতিল হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে বাংলাদেশে এখনো বহুলভাবে প্রচলিত, এমন কিছু ভ্রান্ত বা সমস্যাজনক ধারণার একটা তালিকা পেশ করছি।

- বাঙালিরা একটি সংকর জাতি : এই ধারণার মূলে রয়েছে একদা পৃথিবীতে 'বিশুদ্ধ' কিছু রেস ছিল এমন বিশ্বাস, যা ভ্রান্ত ও সমস্যাজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই কমবেশি মিশ্র।

- বাঙালিদের অন্যতম প্রাচীন জাতিগত উৎস হলো 'দ্রাবিড়' জাতি : দ্রাবিড় আসলে একটি ভাষাগত বর্গ, এবং বাংলার উপর দ্রাবিড় ভাষাসমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাব বা প্রাচীনকালে বাংলা অঞ্চলে দ্রাবিড়ভাষীদের ব্যাপক উপস্থিতির কোনো প্রমাণ নেই।[১০]

- বাঙালি মুসলমানরা প্রধানত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বংশধর : এই ধারণার মূল সমস্যা হচ্ছে এই যে, পূর্ববঙ্গে ইসলামি সংস্কৃতি পৌঁছানোর সময় এ অঞ্চলে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক ছিল না; তাছাড়া 'জাতিভেদ প্রথা থেকে মুক্তির জন্য নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করেছে'–এই তত্ত্ব সমগ্র উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে ইতিহাসসম্মত নয়।[১১]

- বাংলা একটি আর্য পরিবারভুক্ত ভাষা : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের রেওয়াজ অনুসারে এই বর্গীকরণ ঠিক হলেও এর ফলে ভিন্ন 'পরিবার'ভুক্ত বলে চিহ্নিত বিভিন্ন 'দেশি' ভাষা, যেমন–সাঁওতালি, মুণ্ডা, কোচ, গারো, খাসিয়া প্রভৃতির সাথে বাংলার, বিশেষত 'অশুদ্ধ' বলে বিবেচিত বাংলার তথাকথিত বিভিন্ন 'আঞ্চলিক' রূপের যোগসূত্রসমূহ অনেকাংশে দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়।[১২]

প্রসঙ্গ : বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস

'বাঙালি জাতির বয়স কত?' এ প্রশ্ন করা হলে বাংলাদেশে অনেকেই হয়তো বা হাজার বছরের কমে কোনো হিসাব দেবেন না। মুক্তিযুদ্ধকে 'বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন'[১৩] বা বঙ্গবন্ধুকে 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করার রেওয়াজ, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' শিরোনামের গ্রন্থ[১৪] ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বা সংস্কৃতির প্রাচীনতা সংক্রান্ত বিশ্বাস ব্যক্ত হয়, ব্যাপ্তি পায়। বিপরীতে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের প্রাক্কালে এসব পরিচয় কবে কতটা কী আকারে ছিল, থাকলেও সচেতনভাবে বহুজনে তা ধারণ করত কি না–এসব প্রশ্নও রয়েছে। সেগুলোর প্রেক্ষিতে বিশেষ অর্থে একথাও বলা সম্ভব যে, 'বাঙালি জাতি' বলতে এখন অনেকে যা বোঝেন বা বোঝাতে চান, তার অস্তিত্ব হাজার বছর আগে তো ছিলই না, পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল কি না তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

'জাতি' বলতে যদি আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত বা রাষ্ট্রকামী এমন কোনো জনসমষ্টিকে বুঝি, যাদের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মিলের ভিত্তিতে নির্মিত কোনো অভিন্ন ও একক পরিচয়কে সচেতনভাবে ধারণ করার প্রবণতা রয়েছে, তাহলে সে অর্থে বাঙালি কেন, বর্তমান পৃথিবীতে বিরাজমান অধিকাংশ জাতিরই কোনো অস্তিত্ব ছিল না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগ পর্যন্ত। আরো কিছুটা পেছনে ফিরে গেলে, নির্দিষ্ট করে বললে আজ থেকে আড়াইশ' বছর আগে, একই অর্থে কোনো জাতিরই অস্তিত্ব ছিল না পৃথিবীর কোথাও। কারণ সমকালীন 'নেশন' অর্থে 'জাতি' ধারণার আবির্ভাব এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের সূচনা, আসলে

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আগে খোদ ইউরোপে বা ইউরোপীয় কোনো উপনিবেশে ছিল না।

অন্তত বিষয়টাকে সেভাবেই দেখেন বেনেডিক্ট এন্ডারসনের মতো ইতিহাসবিদরা, যাঁরা জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবকে দেখেন গত কয়েক শতাব্দীর বৈশ্বিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।[১৫] তাঁদের বক্তব্য হলো, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক জাতিসমূহের বয়স যত প্রাচীন বলেই মনে করা বা দাবি করা হোক না কেন, বাস্তবে এগুলো সাম্প্রতিক ইতিহাসেরই সৃষ্টি।

সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত বিভিন্ন ইউরোপীয় উপনিবেশে সংঘটিত একাধিক বিদ্রোহ-বিপ্লব, যেমন–১৭৬৫ সালে সূচিত আমেরিকার বিপ্লব, ১৭৯১ সালে শুরু হওয়া হাইতির দাস বিদ্রোহ এবং ১৭৮৯ সালে সূচিত ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনাসমূহ ছিল জাতীয়তাবাদের উন্মেষকাল। এই বয়ান অনুসারে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যসমূহের পশ্চিম গোলার্ধস্থ উপনিবেশগুলোতে সূচিত জাতীয়তাবাদী চেতনার ঢেউ অচিরে খোদ ইউরোপে এসে আছড়ে পড়েছিল, এবং কালক্রমে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ তা এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশেও ছড়িয়ে পড়ে। (জানা যায়, ইউরোপের ভাষাসমূহের মধ্যে 'জাতীয়তাবাদ' অর্থে ব্যবহৃত প্রথম শব্দের প্রয়োগ ঘটেছিল জার্মান ভাষায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, এবং ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দের প্রথম প্রয়োগ ঘটে আরো পরে, ১৮৪৪ সালে।[১৬])

অবশ্য জন্মসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীবাচক ধারণা হিসেবে ইংরেজি 'নেশন' শব্দের ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেও ছিল। একইভাবে কিছুটা সমরূপ অর্থে 'জাতি' শব্দটিরও চল ছিল বাংলাসহ একাধিক ভাষায়।[১৭] যেমন–লালন ফকিরের গানে আমরা 'জাত' শব্দটা পাই এভাবে, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।'[১৮] ব্যুৎপত্তিগতভাবে বাংলায় ব্যবহৃত 'জাত' শব্দটা 'জাতি'র সাথে সম্পর্কিত, অতীতে যেগুলোর অর্থবোধকতার মূল ক্ষেত্র ছিল এই উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বা বর্ণপ্রথা। লালন যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন (আনুমানিক ১৭৭৪ সালে),[১৯] তখনো আমেরিকান বিপ্লব চলছিল, এবং ফরাসি বিপ্লব শুরুই হয়নি। কাজেই তাঁর জীবদ্দশায় ইউরোপ-আমেরিকায় সূচিত জাতীয়তাবাদের কোনো প্রভাব এসে পৌঁছানোর কথা ছিল না, এবং তাঁর রচিত গানের 'জাত' শব্দে রাষ্ট্রকামী জাতীয়তাবাদী চেতনার কোনো প্রভাব থাকারও প্রশ্ন ওঠে না।

বরং 'মুসলমান', 'বামন' ইত্যাদি পরিচয়ের ভেদরেখাকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তিনি 'জাত'কে দেখেছিলেন প্রথাবিরোধী চেতনা থেকে। তবে এখানে 'প্রথা' বলতে শুধু মান্ধাতার আমলের জাতিভেদ ব্যবস্থাকে বুঝলে হবে না। বরং 'সাম্প্রদায়িকতা' বলতে এখন আমরা যা বুঝি, তার ছায়াও আমরা দেখতে পাই। এই ছায়ার পেছনে ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, যার আওতায় রচিত হচ্ছিল 'হিন্দু-মুসলমান' বিভেদভিত্তিক 'সাম্প্রদায়িক' ইতিহাস।[২০] একই সাথে ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সূচিত হয় নতুন একটা সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, যার ভিত্তিতে 'হিন্দু'প্রধান এক নতুন জমিদারশ্রেণির উদ্ভব ঘটে, যাদের বিপরীতে পূর্ববঙ্গে প্রজাসাধারণের অধিকাংশই ছিল মুসলমান।

বাংলাদেশে বর্তমানে 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃ-গোষ্ঠী' প্রভৃত নামে পরিচিত যেসব জাতির বাস রয়েছে, আধুনিক জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের প্রান্তিকতার ইতিহাস শুরু হয়েছিল অনেক আগে–ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের তৈরি 'ট্রাইব' ধারণার নিগড়ে আটকা পড়ার মাধ্যমে। এই প্রান্তিকতা নতুন মাত্রা লাভ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে।

এসব বিবেচনায় লালনের গানগুলোকে ব্রিটিশ শাসনের ফলে সূচিত বিভিন্ন পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লৌকিক প্রজ্ঞা থেকে উৎসারিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ হিসেবে দেখা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কোনো উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসলে সেটা খোঁজার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ মূলত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অধীনে গড়ে ওঠা নতুন একটি সাক্ষর ও শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যেই এই জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটছিল। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চাইতেও ব্রিটিশবিরোধী 'সর্বভারতীয়' চেতনাই ছিল অধিক জোরালো। অন্যদিকে কলিকাতাকেন্দ্রিক 'ভদ্রলোক' শ্রেণি এবং তার আদলে সারা বাংলা অঞ্চলজুড়ে গড়ে উঠতে থাকা 'বাবু' শ্রেণির কাছে 'বাঙালি' বর্গটার সীমানা ছিল অনেক বেশি ছোট। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষ ছিল এই বর্গের বাইরে, যারা বড়জোর ছিল 'বাঙাল', যাদের 'বাঙালি' হয়ে ওঠা এক অর্থে জাতে ওঠারও ইতিহাস।

লালনের সময়কাল থেকে শুরু করে পরবর্তী আরো প্রায় দু'শ' বছর ধরে বাংলা ভাষায় 'জাতি' শব্দটার প্রধান ব্যবহার ছিল জাতিভেদ বা বর্ণপ্রথার প্রেক্ষিতেই। বিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা লেখালেখিতেও এমন উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়, যেমন–'জাতিতে ব্রাহ্মণ (অথবা জাতিতে কায়স্থ, চামার, মুসলমান প্রভৃতি)' ধরনের কথায়, যা এখনো বিরল নয়। এমনকি 'উপজাতি' বা 'আদিবাসী' হিসেবে আখ্যায়িত হয় এমন জনগোষ্ঠীদের বেলায়ও 'জাতি' শব্দের স্বাভাবিক প্রয়োগ ছিল উনিশশ' ষাটের দশক পর্যন্ত।[২১]

অন্যদিকে আরো সম্প্রসারিত বা ভিন্ন পরিসরে প্রকার অর্থেও জাতি শব্দের ব্যবহার চালু ছিল, যথা 'মানব জাতি', 'নারী জাতি', এমনকি 'উদ্ভিদ জাতি'। পক্ষান্তরে 'বাঙালি জাতি' কথাটি অপেক্ষাকৃত বিরলই ছিল বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ। তবে পরবর্তীকালের ইতিহাসে, বিশেষত বাংলাদেশে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিস্তারের প্রেক্ষিতে, 'জাতি' শব্দটির সমকালীন প্রয়োগ ব্যাপকতা পাওয়ার পর অন্যবিধ ব্যবহারগুলো আড়ালে চলে যেতে থাকে।

এই প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, 'বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' আসলে রচিত হয়েছে মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে, ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষিতে, যে প্রক্রিয়া নতুন একটি মাত্রা লাভ করে।

বাঙালি পরিচয়ের রাজনৈতিক সীমানা

এই নিবন্ধ এমন এক সময়ে লিখছি, যখন ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের শেষে বঙ্গবন্ধু 'জয় পাকিস্তান' বলেছিলেন কি না, বা তিনি এবং তাঁর দল সে সময় স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য কতটা প্রস্তুত ছিলেন–এ প্রসঙ্গে দেশে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।[২২] এই বিতর্ক নিয়ে বিস্তারিত

কোনো আলোচনায় আমরা এখানে যাব না,

তবে এটিকে আমরা দেখতে পারি বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে চলে আসা এবং এখনো অমীমাংসিত কিছু মৌলিক দ্বন্দ্বের সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। অমীমাংসিত দ্বন্দ্বসমূহের একটি আবর্তিত হয়েছে সামষ্টিক পরিচয়কে ঘিরে, জাতীয় পরিচয়ের সীমানা নিরূপণের ক্ষেত্রে ভাষা ও ধর্মের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও সম্পর্ক কী হবে, সে প্রশ্নে। অনেকের দৃষ্টিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতেই এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল, বা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে যে তা হয়নি, স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা, বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন এবং সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মের সংযোজন তা-ই প্রমাণ করে।

ভাষা ও ধর্মের বিচারে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বাঙালি মুসলমান। তাদের পরিচয়ের এই দুটি মাত্রার মধ্যে বিরোধ বা টানাপড়েন থাকতেই হবে, এমন কোনো কথা ছিল না, কিন্তু বাস্তবে তা-ই ঘটেছে, যা দেখা গেছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর, বা এমনকি আগে থেকেই, এবং এখনো বিভিন্ন মাত্রায় ক্রিয়াশীল রয়েছে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিসরে। এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে অনেক আলোচনা হয়েছে, এবং এখনো চলছে। সেগুলোর পুনরাবৃত্তিতে না গিয়ে এখানে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় পরিচয় নিরূপণের সমস্যাকে বিবেচনা করব বাঙালি ও মুসলমান, উভয় পরিচয়ের সীমানার বাইরে থাকা বাংলাদেশের সেইসব জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে, যাদেরকে 'জাতি' ধারণার সারিতে অপাঙ্‌ক্তেয় বলে গণ্য করে আসছেন বাংলাদেশের সকল ঘরানার জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকবৃন্দ, এবং সাধারণভাবে এদেশের বিদ্বৎসমাজ।

বাংলাদেশে বর্তমানে 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃ-গোষ্ঠী' প্রভৃত নামে পরিচিত যেসব জাতির বাস রয়েছে, আধুনিক জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের প্রান্তিকতার ইতিহাস শুরু হয়েছিল অনেক আগে–ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের তৈরি 'ট্রাইব' ধারণার নিগড়ে আটকা পড়ার মাধ্যমে। এই প্রান্তিকতা নতুন মাত্রা লাভ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে। যেমন–পূর্ব পাকিস্তানের 'ট্রাইব'দের প্রায় সবাই অমুসলমান হওয়ায় 'মুসলমানদের রাষ্ট্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে তাদের অন্তর্ভুক্তি বা উপস্থিতি ছিল ঐতিহাসিকভাবে বিসদৃশ ঘটনা। অন্যদিকে বাংলাদেশকে যখন দেখা হয় 'বাঙালির রাষ্ট্র' হিসেবে, সেখানেও তারা রয়ে যায় জাতীয়তার কল্পনা-প্রক্রিয়ার বাইরে। অবশ্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবোধের মূল সীমারেখা গড়ে উঠেছিল উর্দু ভাষার আধিপত্য, রাষ্ট্রযন্ত্রে পাঞ্জাবিদের দৌরাত্ম্য বা অর্থনীতিতে 'অবাঙালি'দের দাপট ইত্যাদির বিপরীতে। একাত্তরের প্রেক্ষিতে 'অবাঙালি' বলতে শুধুই উর্দুভাষী বা পশ্চিম পাকিস্তানিদের বোঝাত, গারো, সাঁওতাল, চাকমা প্রভৃতি জাতির কাউকে নয়। এখনো অবাঙালি (বা মৌখিক আলাপচারিতায় 'নন-বেঙ্গলি') শব্দটা বাংলাদেশে মূলত 'বিহারি' নামে পরিচিত উর্দুভাষীদের বেলায়ই বেশি প্রয়োগ করা হয়।[২৩] সেদিক থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডে

বহু প্রান্তিক জাতিভুক্ত অগণিত মানুষ সক্রিয়ভাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, সহযোগিতা করেছিল, জীবন দিয়েছিল। ওঁরাও, কোচ, সাঁওতাল, রাজবংশী, মালো, গারো, হাজং, খাসিয়া, মণিপুরি, ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা–কারা ছিল না তাদের মধ্যে?

অবস্থিত 'উপজাতীয়' বা 'আদিবাসী' নামে অভিহিত মানুষদের কখনো প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেননি। বরং বিভিন্ন ধারার বাঙালি রাজনীতিকরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানিক পরিসরে আদিবাসীদেরকে দেখেছেন ও পেয়েছেন তাঁদের মিত্র ও সহযোদ্ধা হিসেবে। একাত্তরের বহু আগে থেকেই, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক ও সামন্ত শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন বিদ্রোহ, সংগ্রাম ও আন্দোলনে, এই ধারা চালু ছিল, ১৯৭১ সালেও যা অব্যাহত থাকে।

সবাই জানেন, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত বহু প্রান্তিক জাতিভুক্ত অগণিত মানুষ সক্রিয়ভাবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, সহযোগিতা করেছিল, জীবন দিয়েছিল। ওঁরাও, কোচ, সাঁওতাল, রাজবংশী, মালো, গারো, হাজং, খাসিয়া, মণিপুরি, ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা–কারা ছিল না তাদের মধ্যে? 'এটা তো বাঙালিদের যুদ্ধ। আপনারা কেন এতে অংশ নিচ্ছেন?'–এ ধরনের প্রশ্ন তাদেরকে নিজেদের সম্প্রদায়ের ভেতর বা বাঙালি সহযোদ্ধাদের মধ্য থেকে কেউ করেছিল, এমন কথা আমি আজ পর্যন্ত কখনো শুনিনি বা কোথাও পড়িনি।[২৪] অন্যদিকে 'আমরা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও স্বকীয় পরিচয় ছেড়ে বাঙালি হয়ে যাব'–এমন কোনো স্বপ্ন তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে রকম বিশেষ কোনো প্রমাণও আমাদের চোখে পড়ে না।[২৫] এদিক থেকে এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, এবং তার মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্র বাংলাদেশকে শুধুমাত্র 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির দেশ' হিসেবে বেঁধে ফেলা হয়েছিল স্বাধীনতার পর থেকেই। সন্দেহ নেই, ১৯৫২ সালে সূচিত ভাষা আন্দোলনের জের ধরে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠায় সাংস্কৃতিকভাবে সেটাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও সবার উপরে উঠে এসেছিল।

বৈষম্যের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আবেদনকে আরো ব্যাপক গণভিত্তিক শ্রেণিসংগ্রাম বা মানবতাবাদের নিরিখে দেখার মতো ব্যক্তি বা দলও নিশ্চয় এদেশে ছিল।[২৬] তবে বাস্তবতা হলো, ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, সে প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া সকল দল, মত ও সম্প্রদায়ের মানুষদের সবার মতামত দেয়ার সমান সুযোগ ছিল না। কারণ যে গণপরিষদে আলোচনার ভিত্তিতে সংবিধানটি প্রণীত হয়েছিল, তার প্রায় সব সদস্যই ছিলেন একই রাজনৈতিক দলভুক্ত। আলোচনার জন্য পেশকৃত সেই সংবিধানের খসড়ার ব্যাপারে মৌলিক আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন মাত্র দুজন, যাঁদের একজন ছিলেন তৎকালীন একমাত্র 'বিরোধীদলীয়' সদস্য, ন্যাপের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, যিনি শেষ পর্যন্ত সংবিধানে স্বাক্ষরদানে বিরত ছিলেন বলে জানা যায়; অপরজন ছিলেন নির্দলীয় সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, যাঁর নিঃসঙ্গ প্রতিবাদী কণ্ঠকে উপেক্ষা করে সহজেই সংবিধানে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাঙালী'[২৭] হিসেবে পরিচিত হবে, এমন একটি প্রস্তাব।[২৮]

আর রাষ্ট্রের চার মূলনীতির একটি হিসেবে গৃহীত 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ' তো ছিলই।

এভাবেই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের শুরুতেই 'জাতি'র ধারণাকে একচ্ছত্রভাবে 'বাঙালী' পরিচয়ের সাথে বেঁধে ফেলাটাকেই স্বাভাবিক মনে করেছিলেন এই নবীন রাষ্ট্রের স্থপতিরা। বাংলা অঞ্চল যে বরাবরই বহু জাতির দেশ ছিল, এবং সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশও যে এর ব্যতিক্রম ছিল না–এই উপলব্ধি হারিয়ে যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে।

এক্ষেত্রে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত ২৩ক ধারাকে তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র অস্তিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে দেখাতে চাইলেও এদেশে যে জাতি আসলে একটাই–বাঙালি, এবং একাত্তরে শুধু বাঙালিরাই যুদ্ধ করেছিল, এই দৃষ্টিভঙ্গিই দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, সংবিধানের প্রথম ভাগে 'নাগরিকত্ব' বিষয়ক ৬(খ) ধারায় বলা আছে, "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন" এবং দ্বিতীয় ভাগে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অংশ হিসেবে উল্লিখিত 'জাতীয়তাবাদ'কে (৯ নং ধারা) বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নরূপভাবে[২৯]

"ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।"

বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় ও ইতিহাসের এই বাঙালি-সর্বস্ব বয়ানকে সাংবিধানিক মহিমা দেয়ার পর 'অন্য'দের অস্তিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে দেখানো ২৩ক ধারার আসলে বিশেষ কোনো অর্থ থাকে না। 'উল্লেখ্য, উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি' শীর্ষক এই ধারার আওতায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" লক্ষণীয় যে, এই ধারায় 'আদিবাসী স্বীকৃতি'র দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়, বিশেষত ভূমি ও ভাষা, সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই।

এই বাস্তবতার পাশাপাশি যখন আমরা পূর্বোল্লিখিত ধারাসমূহের বাঙালি-সর্বস্বতা বিবেচনা করি, তাহলে বুঝতে কষ্ট হয় না, পঞ্চদশ সংশোধনীর ২৩ক ধারাকে এদেশের 'আদিবাসী' পরিচয়ের স্বীকৃতির প্রত্যাশী বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন কেন ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের সংবিধানে 'উপজাতি' বা অন্য কোনো তুলনীয় বর্গ উল্লিখিত না থাকলেও একথা বলা ছিল যে, নাগরিকদের 'অনগ্রসর' অংশের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং নেবে। কার মানদণ্ডে বা কোন অর্থে 'অনগ্রসর', সে ব্যাখ্যা অবশ্য সংবিধানে ছিল না বা এখনো নেই, কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এই বিধানের বলেই তথাকথিত 'উপজাতি'দের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারিত বিভিন্ন বিশেষ ব্যবস্থার সাংবিধানিক বৈধতা খোঁজা হয়ে আসছে। বিষয়টা যে মৌলিকভাবেই অবমাননাকর, এই উপলব্ধি সংবিধান প্রণেতা বা বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

বাংলা অঞ্চল যে বরাবরই বহু জাতির দেশ ছিল, এবং সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশও যে এর ব্যতিক্রম ছিল না–এই উপলব্ধি হারিয়ে যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে।

অন্যদিকে প্রথম সংবিধানে 'উপজাতি' বা অনুরূপ কোনো বর্গ না থাকলেও 'ট্রাইব' অর্থে 'উপজাতি' ধারণার প্রাসঙ্গিকতা বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবেই মেনে নিয়েছিল ১৯৭২ সালেই, ১৯৫৭ সালে প্রণীত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১০৭ নম্বর কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করার মাধ্যমে। কনভেনশনটি ছিল 'ইনডিজেনাস ও ট্রাইবাল পপুলেশন' বিষয়ক একটি আইন,

যেটি চরিত্রগতভাবে ছিল আত্তীকরণবাদী, অর্থাৎ 'ইনডিজেনাস বা ট্রাইবাল' জনগোষ্ঠীর লোকেরা একটা পর্যায়ে জাতীয় মূল স্রোতে মিশে যাবে–এমন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। হয়তো বা সে কারণেই আইনটির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে নবীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কোনো আপত্তি ছিল না। এ প্রসঙ্গে 'ট্রাইব' ধারণার বাংলা রূপ 'উপজাতি' শব্দটার একটা বিশেষ ব্যঞ্জনার উপর আলোকপাত করার মাধ্যমে বাঙালি পরিচয়ের রাজনৈতিক সীমানার উপর এই অনুচ্ছেদে ইতি টানব।

'ট্রাইব' ধারণাটির মূল অর্থ যা-ই হোক না কেন, বাংলা ভাষায় এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত 'উপজাতি' শব্দের একটা ব্যঞ্জনা কাজ করে 'জাতির উপবিভাগ' অর্থে। এদিক থেকে কোনো জনগোষ্ঠীকে 'জাতি'র 'উপ' হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে তাদের উপর এক ধরনের ভাষিক ঔপনিবেশকতা আরোপ করা হয়, যা আর্থ-রাজনৈতিক নব্য-ঔপনিবেশিকতার মতাদর্শিক রাস্তাও খুলে দেয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের নাগরিকদের সামষ্টিক (জাতিরাষ্ট্রিক) পরিচয় 'বাঙালী' বা 'বাংলাদেশী' যে নামেই রাখা হোক, 'উপজাতি' ধারণাটা চালু রাখলে তার মাধ্যমে এক ভাষা ও এক জাতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ধারণাকে বহাল রাখা যায় স্বচ্ছন্দে।

এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে, বিগত চার দশক ধরে বাংলাদেশে প্রধান যে দুই জাতীয়তাবাদ (বাঙালি বনাম বাংলাদেশি) পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত রয়েছে, সেগুলোর কোনো পক্ষের প্রবক্তারাই বাঙালিদের বেলায় 'উপজাতি' ধারণাটা প্রয়োগ করেনি কখনো। বাস্তবে সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, এমনকি আইনগতভাবেও, উভয় ধারার সমর্থকদের বেলায়ই 'বাঙালী' পরিচয়ের পরিধি থেমে যায় 'উপজাতীয়' বর্গের সীমানার ধারে। যেমন–পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য বিভিন্ন আইনে ব্যবহৃত 'অ-উপজাতীয়' বর্গটি বাস্তবে 'বাঙালী'র সমার্থক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।[৩০] এ প্রসঙ্গে খাগড়াছড়ি শহরের মতো জায়গায় বিগত এক যুগের মধ্যে দেয়াললিখন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা একটি রাজনৈতিক স্লোগানের কথা উল্লেখ করা যায়, যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। স্লোগানটা হলো, 'আমরা অ-উপজাতীয় নই। আমরা বাঙালী।' পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানিক রাজনৈতিক সমীকরণগুলোর খোঁজখবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন এই স্লোগানের পেছনে 'বাঙালী' ও 'বাংলাদেশী' উভয় নামের জাতীয়তাবাদের স্থানীয় সমর্থকরা রয়েছেন। স্লোগানটির পেছনে থাকা প্রচ্ছন্ন অনুমানকে সামনে আনলে বলতে হয়, উপজাতীয়রা 'অ-বাঙালী'।

এই প্রবণতাগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা বিগত চার দশককালে বাঙালি পরিচয়ের রাজনৈতিক সীমানা স্পষ্ট হয়ে ওঠার দুটি প্রধান পর্যায় দেখি : একাত্তরের মুক্তিপিয়াসি বাঙালিদের রাজনৈতিক চেতনা

বিকশিত হয়েছিল তাদের 'উপরে' চেপে বসা পাঞ্জাবি, বিহারি প্রমুখ অস্থানীয় 'অবাঙালী'দের বিপরীতে, অন্যদিকে এই চেতনা এখন সাবালক হচ্ছে 'নিচে' থাকা 'উপজাতীয়' বা 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা জাতিসত্তা' বর্গভুক্ত স্থানীয় 'অ-বাঙালী'দের উপর রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েমের মাধ্যমে।

উপসংহার : ক্ষুদ্রতার স্বরূপ

এই উপমহাদেশের কলঙ্ক হিসেবে বিবেচিত বর্ণপ্রথা এবং পশ্চিমা সভ্যতার গৌরবকে ম্লান করে রাখা বর্ণবাদ পৃথক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বিকশিত হলেও উভয় ধারার মধ্যে গভীর কিছু সাদৃশ্যও রয়েছে। অধিকন্তু নাৎসিবাদের বদৌলতে উভয় ধারার ইতিহাস একটা ভয়ংকর মোহনায় এসে উপনীত হয়েছিল, যেখানে কল্পিত আর্য শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে নতুন একটি শুদ্ধ ও মহান 'নৃ-গোষ্ঠী' তৈরির মহাযজ্ঞে বলি হয়েছিল ষাট লাখের মতো ইহুদি, বহু জিপসি ও অন্যান্য নাৎসিবাদবিরোধী জার্মানসহ এক কোটির বেশি মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারা পৃথিবীতে যে সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছিল, সেটা বিবেচনায় নিলে এ ধরনের মতাদর্শের ভয়ংকর পরিণতি কী হতে পারে, তা ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সকলে কমবেশি কল্পনা করে নিতে পারেন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিরা পরাজিত হলেও ফ্যাসিবাদ আসলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, বরং ইউরোপের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহ ভেঙে গিয়ে সেগুলোর জায়গায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রে নতুন অবয়বে বিস্তার লাভ করেছে। এক অর্থে সকল ধরনের জাতীয়তাবাদের মধ্যেই ফ্যাসিবাদের প্রবণতাও মিশে থাকে, যা সময়-সুযোগ পেলে বিকাশ লাভ করে। এই নিবন্ধে উপরে যেসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি, তার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও একই ধরনের প্রবণতার প্রবল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

'উপজাতি' নামে অভিহিত জনগোষ্ঠীদেরকে 'আদিবাসী' পরিচয়ের স্বীকৃতি দেয়ার বিরুদ্ধে যে ধরনের আপত্তি ও মিথ্যাচার বাংলাদেশে দেখা যায়, এবং যে ধরনের জিঘাংসার সাথে তা প্রকাশিত হয়, তাতে উল্লিখিত প্রবণতার আলামত মেলে। 'আদিবাসী' পরিচয়ের তাৎপর্য বা প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে অবশ্য পক্ষে-বিপক্ষে বহু আলোচনা ও বিতর্ক ইতোমধ্যে হয়েছে।[৩১]

এখানে সেসবের পুনরাবৃত্তিতে না গিয়ে আমরা শুধু বিবেচনা করব বিকল্প হিসেবে সাংবিধানিকভাবে বরাদ্দকৃত শব্দগুলোর মহিমা। আমরা দেখেছি, সংবিধানে বর্তমানে 'উপজাতি' শব্দটার পাশাপাশি রয়েছে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' (minor race) ও '(ক্ষুদ্র) নৃ-গোষ্ঠী' (ethnic sect)।[৩২] সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহের উপর এক শতাব্দী আগের বর্ণবাদের যে ছায়া এখনো বিরাজ করছে, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে খুব সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু পর্যবেক্ষণ আমরা যোগ করব।

প্রথমত, 'ক্ষুদ্র' বিশেষণের বহুল ব্যবহার লক্ষ করার মতো। এই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন তোলা যায়, এটি কেন অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগুরুর মতামত অগ্রাধিকার পাবে, এটা সবাই মানে ও বোঝে, অন্যদিকে যারা সংখ্যায় খুব কম, তাদের জন্যও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকবে, তা-ও প্রত্যাশিত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদেরকে সারক্ষণ 'ক্ষুদ্র' 'ক্ষুদ্র' বলে তাদের 'নগণ্যতা'র কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, বা সেটা সবার নজরে আনতে হবে। তাছাড়া শুধু সংখ্যালঘুতার বিচারেই যে সংশ্লিষ্টদের 'ক্ষুদ্র' বলা হচ্ছে, তা মনে হয় না। বরং তারা সাংস্কৃতিক বা অন্যান্য মানদণ্ডে হীন ('উপ-', 'অনগ্রসর' ইত্যাদিও স্মর্তব্য), এই দৃষ্টিভঙ্গিও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। এদিক থেকে 'ক্ষুদ্রতা'র প্রতি এত প্রবল মনোযোগ আসলে সাংবিধানিক শব্দচয়নের মালিকদের মানসিক দীনতা ও ক্ষুদ্রতাই প্রকাশ করে।

বাংলাদেশের নাগরিকদের সামষ্টিক (জাতিরাষ্ট্রিক) পরিচয় 'বাঙালী' বা 'বাংলাদেশী' যে নামেই রাখা হোক, 'উপজাতি' ধারণাটা চালু রাখলে তার মাধ্যমে এক ভাষা ও এক জাতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ধারণাকে বহাল রাখা যায় স্বচ্ছন্দে।

এখানে উল্লেখ্য, 'জাতি' ধারণার বর্গে বাঙালি ছাড়া অন্য কাউকে প্রবেশ করতে না দেয়ার প্রয়াসে সাংবিধানিকভাবে বরাদ্দ শব্দগুলোর পাশাপাশি অনেকে নতুন কিছু পারিভাষিক উদ্ভাবনেরও আমদানি করেছেন, যেমন–'জনজাতি', যেনবা 'মুণ্ডা জাতি', 'ম্রো জাতি', 'চাক জাতি' ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করলে মহাভারত বা বলা ভালো, বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা, অশুদ্ধ হয়ে যাবে! আমরা জানি, শুদ্ধাশুদ্ধ বাছবিচার হচ্ছে সনাতনি জাতিভেদ প্রথার প্রধান মতাদর্শিক বৈশিষ্ট্য। বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতিকে বাংলাদেশের জাতীয়তার সংজ্ঞায়নে না রাখাকে এই প্রবণতার একটা বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বাঙালিদের মধ্যে যারা জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোয় মর্যাদার আসনে আসীন হতে চান, তাঁদেরকেও কিছু শুদ্ধাচার পালন করতে হয়, মেনে নিতে হয় 'শুদ্ধ বাংলা'র দাপট। এই পরিসরে কোনো ধরনের 'চুদুরবুদুর' বা অনন্ত জলিল-সুলভ ইংরেজিপনাকে স্বাগত জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। এই মানসিকতা এক ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদই বৈকি।

আমরা শেষ করব লালনের প্রসঙ্গ আরেকবার উল্লেখ করে, যাঁর গানের কথা এই নিবন্ধের শিরোনাম ও বক্তব্য সাজানোর ক্ষেত্রে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। লালনের লৌকিক মানবতাবাদকে পরবর্তীকালের দ্বিজাতি তত্ত্ববিরোধী 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ'-এর একটা উৎস হিসেবে দেখা যেতে পারে, অনেকে দেখেনও। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরম্পরার অনুসন্ধান হয়তো বা ঠিকই আছে, কিন্তু 'বাঙালিত্ব'কে চরম ধরে নিয়ে তা করা হলে তা হবে লালনের ইতিহাস-বিযুক্ত ও আরোপিত পাঠ। যে কারণে লালন 'জাত'কে নাকচ করেছিলেন, একই কারণে সম্ভবত আধুনিক কালের 'জাতি'র ধারণাকেও তিনি সন্দেহের চোখেই দেখতেন।[৩৩]

প্রশান্ত ত্রিপুরা: নৃবিজ্ঞানী। লেখক ও গবেষক।
ইমেইল: prashanta.tripura@gmail.com

টীকা ও তথ্যসূত্র :

১. উল্লেখ্য, ইংরেজি ethnic বা ethnicity শব্দের মূল উৎস হলো প্রাচীন গ্রিক শব্দ ethnos, যা দিয়ে বোঝাত 'জাতি'; সেই মূল অনুসারেই নামকরণ করা হয়েছে নৃবিজ্ঞানের বিশেষায়িত দুটি ধ্রুপদি ধারা ethnography ও ethnology (জাতিতত্ত্ব)-এর।

২. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড' (বাংলা একাডেমি প্রকাশিত, ১৯৮৭) গ্রন্থের প্রধান সম্পাদক আনিসুজ্জামানের সাথে সম্পাদনা পরিষদে যুক্ত ছিলেন আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহম্মদ, মমতাজুর রহমান তরফদার ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' অধ্যায়ের রচয়িতা ছিলেন অজয় রায়, যাঁর মূল পেশাগত পরিচয় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে।

৩. মিখাইল নেস্তুর্খের (Mikhail Nesturkh) লেখা ও দ্বিজেন শর্মা অনূদিত একটি বই–'মানব সমাজ : জাতি প্রজাতি ও প্রগতি' (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৬)–একসময় বাংলাদেশে সুলভ ও বহুল পঠিত ছিল।

৪. 'নৃ-গোষ্ঠী' পদটি সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে পরিচিত করে তোলার 'কৃতিত্ব' প্রয়াত সেলিম আল দীন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকের নামে দাবীকৃত হতে দেখা গেছে।

৫. বইটির লেখক ছিলেন জেমস ওয়াইজ, যিনি ১৮৬০-এর দশকে ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন; ১৮৮৩ সালে প্রথম মুদ্রিত বইটির বাংলা অনুবাদ তিন ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে (ইউপিএল কর্তৃক)।

৬.http://www.lawcommissionbangladesh.org/reports/126- BB%20Act%202014%20Concept%20Paper.pdf; প্রাসঙ্গিক আলোচনা সংবলিত একটি সম্পর্কিত সূত্র হলো http://alalodulal.org/2014/06/22/untouchable-2/

৭. দৈহিক বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক রেস-এর ধারণা যে সমকালীন নৃবিজ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়েছে, তা বোঝা যাবে দৈহিক নৃবিজ্ঞানের উপর যে কোনো সাম্প্রতিক টেক্সট বই খুলে দেখলে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, Robert Jurmain et al. (2014) Introduction to Physical Anthropology [2013-14 Edition], Belmont, CA: Wadsworth.

৮. Franz Boas (1940) Race, Language and Culture. New York: The Macmillan Company

দ্রঃ (বইটি ছিল ১৮৮৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লেখা বোয়াসের বিভিন্ন পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন)।

৯. Herbert Hope Risely ছিলেন একজন ঔপনিবেশিক প্রশাসক, যিনি ১৮৮৫ সালে বাংলার 'এথনোগ্রাফিক সার্ভে' পরিচালনা করার দায়িত্ব পান। নাসাঙ্ক (nasal index), শিরাঙ্ক (cephalic index) প্রভৃতি মাপজোকের ভিত্তিতে পরিচালিত এই কাজের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি মেনে নেয়া হলেও সার্বিকভাবে সেটিকে 'কালজয়ী' হিসেবে অভিহিত করেছেন অজয় রায় ('বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮)।

১০. এটা অনুমান করা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন 'সিন্ধু সভ্যতা'র মূল ধারক-বাহকরা দ্রাবিড় ছিল, যারা 'আর্য'দের চাইতেও বেশি 'সভ্য' ছিল–এমন ধারণা তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়দের কল্পনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার ফলে কল্পিত আর্য বা আশরাফ উৎসের বদলে 'দ্রাবিড়' বর্গে নিজেদের অতীত খুঁজতে শুরু করেন–এখনো খোঁজেন–অনেকে।

১১. Richard Eaton (1996) The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760. Berkeley: University of California Press. ইটনের বক্তব্যের উপর Himal Southasian, October 11, 2012-তে প্রকাশিত এই নিবন্ধকার লিখিত Becoming Bangladeshi শিরোনামের একটি রচনায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। লিংক : http://himalmag.com/becoming-bangladeshi/

১২. এই নিবন্ধকারের ১৯৯২ সালে লিখিত The Colonial Foundation of Pahari Ethnicity (Journal of Social Studies-এ প্রকাশিত) শিরোনামের একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে। প্রবন্ধটি 'পাহাড়ী গোষ্ঠীপরিচয়ের ঔপনিবেশিক ভিত্তি' শিরোনামে নিম্নলিখিত গ্রন্থের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল : বাংলার বহু জাতি, ভেলাম ভ্যান সেন্দেল ও এলেন বল সম্পাদিত; দিল্লি : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ১৯৯৮।

১৩. বাঙালির ইতিহাস আলোচনায় হাজার বছরের হিসাব চালু হওয়ার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল আনুমানিক এক হাজার বছর পূর্বে রচিত চর্যাপদ, যেটিকে বিবেচনা করা হয় বাংলা ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম কাব্য বা সাহিত্য নিদর্শন হিসেবে। তবে অধুনা উয়ারী-বটেশ্বরের মতো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বা অন্যান্য আবিষ্কারের ভিত্তিতে হাজার বছরের গুণক হিসেবে আড়াই থেকে পাঁচ সংখ্যার ব্যবহার হয় অবলীলায়। যেমন–এদেশের একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমাজউদ্দিন আহমেদ কালের কণ্ঠ পত্রিকার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধ : বাঙালির হাজার বছরের অর্জন' শিরোনামের এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল এ জাতির চার হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়।'

১৪. গোলাম মুরশিদ (২০০৫) হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, ঢাকা : অবসর প্রকাশন

১৫. Anderson, Benedict (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso

১৬. Nationalism পদের উপর উইকিপিডিয়া ও মেরিয়াম ওয়েবস্টার অনলাইন ডিকশনারিতে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪-তে পাওয়া তথ্য; সূত্র : http://en.wikipedia.org/wiki/Nationalism; http://www.merriam-webster.com/dictionary/nationalism

১৭. উল্লেখ্য, নেশন ও জাতি উভয় শব্দের মূল (যথাক্রমে ল্যাটিন ও সংস্কৃত ধাতু) দিয়ে 'জন্মগ্রহণ' বোঝায়।

১৮. উৎসভেদে গানের কথাগুলোতে কিছু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন–'জাত' শব্দটি দু-এক জায়গায় (দ্বিতীয় চরণে) 'জাতি' ও 'জেত' হিসেবেও লেখা আছে। এখানে উদ্ধৃত (৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সংগৃহীত) ভাষ্যটির উৎস হলো http://bn.wikisource.org/wiki/সব-লোকে-কয় লালন-কি-জাত-সংসারে

১৯. লালনের যে জন্মসাল উইকিপিডিয়ায় উল্লেখ করা আছে (৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সংগৃহীত; http://bn.wikipedia.org/wiki/লালন), যে অনুযায়ী মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হওয়ার কথা মোট ১১৬ বছর, সেটি গবেষক সমাজে কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত তা স্পষ্ট নয়।

২০. সলিমুল্লাহ খান ২০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বণিক বার্তায় প্রকাশিত 'সাম্প্রদায়িকতা' নামক একটা নিবন্ধে লিখেছেন, "১৮২৯-৩০ সালে ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী জেমস টড একটি বই লিখিলেন। তাহাতে রাজস্থানের রাজদাঙ্গার কাহিনীকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসেবে দেখানো হইল। রাজপুত আর মোগলের লড়াইকে হিন্দু ও মুসলমানের লড়াই আকারে দেখাইলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেইখান হইতে পাঠ লইতে পিছুপা হন নাই। ১৯৪৭ ইহারই জেরবাদ।" ভারতে মুসলমান শাসনকে 'বিজাতীয়' হিসেবে দেখার বেলায় রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে খোদ 'সাবঅলটার্ন' অধ্যয়নের পথিকৃৎ রণজিৎ গুহ, গৌতম ভদ্র প্রমুখের মধ্যেও ব্রিটিশ নির্মিত 'সাম্প্রদায়িকতা'র ছায়া দেখা যায় বলে দাবি করেছেন

সলিমুল্লাহ খান। তাঁর দাবির যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক, এমন কাজের মধ্যে রয়েছে 'সাবঅলটার্ন' গোষ্ঠীভুক্ত Gyan Pandey-র বই The Construction of Communalism in Colonial North India (Oxford University Press, 2006).

২১. আবদুস সাত্তার লিখিত আরণ্য জনপদে (১৯৬৬ সালে প্রকাশিত এবং জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত) গ্রন্থে চাকমা, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে একই সাথে 'উপজাতি', 'আদিবাসী', 'জাতি' প্রভৃতি শব্দ দিয়ে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ (এপ্রিল ১৯৭৫) সাম্প্রতিককালে পুনঃপ্রকাশ করেছে নওরোজ সাহিত্য সম্ভার (২০১২)।

২২. বিতর্কের সূত্রপাত সম্প্রতি প্রকাশিত এ কে

খন্দকারের লেখা ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে (প্রথমা প্রকাশনী, ২০১৪) বইয়ে দেয়া কিছু তথ্য ও মতামতকে ঘিরে।

২৩. ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে বাঙালি মনে করি না, কখনো করিনি, কিন্তু তাই বলে নিজেকে কখনো 'অবাঙালি' হিসেবে অভিহিত করিনি, বা সেভাবে আখ্যায়িত হতেও অভ্যস্ত ছিলাম না। এই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি 'আদিবাসী' পদটির পক্ষে নন, এমন একজন লেখক-সাংবাদিক আলোচ্য বর্গের মানুষদের বোঝাতে ফেসবুকে 'অ-বাঙালি' পদটি ব্যবহার করাতে তা নিয়ে তাঁর সাথে একদফা মন্তব্য বিনিময় হয়েছিল আমার।

২৪. এই নিবন্ধকারকে অবশ্য প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে হয়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, ২০১২ সালে 'আদিবাসী দিবস' উপলক্ষে একটি টিভি চ্যানেলের আয়োজিত একটা 'লাইভ টক শো'তে, যেখানে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক, যিনি এদেশের একজন পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আমাকে প্রশ্ন করে বসেন, "আপনারা কেন একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?" নিজের অপ্রস্তুত ভাব সামলে নিয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক' গোছের কিছু কথা বলে সে যাত্রা আমি 'শো'টাকে চালু রাখতে সহায়তা করেছিলাম। কিন্তু পরে আমার মনে হয়েছিল, সঞ্চালকের প্রশ্নের পেছনে যেসব অনুমান কাজ করছিল, সেগুলোকেই সামনে নিয়ে আসা, প্রশ্নবিদ্ধ করা, জরুরি ছিল।

২৫. অবশ্য ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী এম এন শ্রীনিবাস বর্ণিত 'সংস্কৃতায়ন' প্রক্রিয়ায় 'ক্ষত্রিয়' হিসেবে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কিছু জাতির লোকজন উচ্চবর্ণের আচার-অনুষ্ঠান ও ভাষা-সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে রপ্ত করে বাঙালি বর্ণ সমাজে মিশে যেতে শুরু করেছিল, এরকম উদাহরণও আছে (যেমন–'দেব বর্মণ' উপাধিধারী ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্যবর্গ, এবং উত্তরবঙ্গে 'কোচ' বা অনুরূপ কোনো জাতি থেকে উদ্ভূত 'রাজবংশী', 'বর্মণ', 'রায়' প্রভৃতি উপাধিধারী কিছু সম্প্রদায়), তবে বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে সেগুলো প্রাসঙ্গিক নয়। 'সংস্কৃতায়ন' ধারণার জন্য দেখুন, গ ঘ Srinivas (1956) A Note on Sanskritization and Westernization, The Journal of Asian Studies, Volume 15: Issue 04 [August 1956] pp 481-496; (1966) Social Change in Modern India. Berkeley: University of California Press. [বইটির প্রথম অধ্যায় হলো 'Sanskritization' নিয়ে]

২৬. এ দুই ধারার সম্ভাব্য উদাহরণ হিসেবে এখানে মুক্তিযুদ্ধকালীন জনপ্রিয় হওয়া দুটি গানের কথার অংশবিশেষ (ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত) উদ্ধৃত করা গেল–প্রথমটি লিখেছিলেন ভারতীয় বাঙালি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং দ্বিতীয়টি ছিল আলী মহসীন রেজার লেখা এবং খাদেমুল ইসলাম বসুনিয়ার সুরে রথীন্দ্রনাথ রায়ের গাওয়া : ১। "বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ,/বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান,/আমরা সবাই বাঙ্গালী।" ২। "চাষাদের মুটেদের মজুরের/গরিবের নিঃস্বের ফকিরের/আমার এ দেশ সব মানুষের, সব মানুষের॥/.../নেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারে,/নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারে॥/হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, দেশমাতা এক সকলের।" উল্লেখ্য, ব্যক্তিগতভাবে দুটি গানের মধ্যে দ্বিতীয়টি এই নিবন্ধকারের শোনা ছিল ছোটবেলা থেকেই, কিন্তু প্রথমটির সাথে পরিচয় ঘটেছে অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি (শাহবাগের 'গণজাগরণ'-এর প্রেক্ষিতে কথাগুলো স্লোগান ও পোস্টারের আকারে উঠে আসা ও সেই সূত্রে সূচিত একটা বিতর্কের প্রেক্ষিতে)।

২৭. এই নিবন্ধে 'বাঙালি' ও অন্যান্য নাম বা শব্দের বেলায় বর্তমানে প্রচলিত বানানরীতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে, তবে যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মূল উৎসে ব্যবহৃত বানানও অনুসরণ করা হয়েছে। সেভাবেই সংবিধানে ব্যবহৃত 'বাঙালী' বানান এখানে দেখানো হয়েছে।

২৮. পর্যালোচিত সূত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের দেয়া 'বাংলাদেশের সংবিধান স্মারক বক্তৃতা' (বাংলাদেশের সংবিধান দিবস উপলক্ষে ১৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বাঙলার পাঠশালা আয়োজিত), যার বিবরণ রয়েছে 'সংবিধানের অঙ্গীকার আমরা মান্য করছি না' শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে (http://ekotha.com/?p=650, মূল উৎস : বণিক বার্তা, ১৭ নভেম্বর ২০১৩); পর্যালোচিত আরো দুটি ওয়েব-সূত্র :

http://abulkhayer.wordpress.com/2011/12/10/বাংলাদেশ-গণপরিষদ-?-সংবিধ/; http://www.somewhereinblog.net/blog/odong/29269600

২৯. এই নিবন্ধে উদ্ধৃত সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে নেওয়া http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=957

৩০. 'অ-উপজাতীয়' ধারণাটি সরকারি মহলের বাইরে সংবাদমাধ্যমেও নিয়মিতই ব্যবহৃত হয়। যেমন–'উপজাতি'/'অ-উপজাতি' বিভাজনটি ১৭ অক্টোবর ২০১২ তারিখের প্রথম আলোর সম্পাদকীয়তে জায়গা পেয়েছে।

৩১. এ প্রসঙ্গে এই নিবন্ধকারের লেখা 'আরণ্য জনপদের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সনদের ছায়াতলে : বাংলাদেশে আদিবাসী পরিচয় পুনঃনির্মাণের দুই দশক (১৯৯৩-২০১৩)' শিরোনামের নিবন্ধ দেখা যেতে পারে, যা আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০১৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম প্রকাশিত সংহতি ২০১৩ নামক সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির একটি সম্পাদিত ভাষ্য নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত ব্লগে পাওয়া যাবে।

http://ptripura1.wordpress.com

৩২. সংবিধানে সন্নিবেশিত 'নৃ-গোষ্ঠী' শব্দটির হাইফেন এটির আপেক্ষিক নবীনত্ব নির্দেশ করছে।

৩৩. সেদিক থেকে লালন যে সর্বকালে শ্রেষ্ঠ ২০ বাঙালির তালিকায় ১২ নম্বরে জায়গা করে নিয়েছিলেন (২০০৪ সালে পরিচালিত বিবিসি বাংলার একটা জরিপের ফলাফল অনুসারে), তা কিছুটা পরিহাসের বিষয় বটে!